# প্রথম

## উত্তম চৌধুরী

বিখ্যাত কোনও সাহিত্যিকের মুখোমুখি। সেই প্রথম। বেশ কয়েকবছর আগের কথা, ১৯৮৭ সালের ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি। আমি তখন শহর থেকে অনেক দূরে জয়ন্তী হাইস্কুলে শিক্ষকতা করি। সে সময়ে একদিন স্কুল ছুটি হলে আমি আমার এক সহকর্মীকে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে জয়ন্তী নদীর দিকে এগোচ্ছিলাম। নদীটি ভীষণ টানত। পাথরে পাথরে নাচতে নাচতে সে যেন নীচে নেমে এসেছে। বর্ষা ছাড়া সব সময়ই স্বচ্ছ জল। জলের নীচে রঙিন নুড়ি-পাথর। জলে পাহাড়ি মাছ হঠাৎ দেখা যায় আবার হঠাৎ উধাও। নদীর উপর ব্রিটিশ আমলের তৈরি ব্রিজে দাঁড়িয়ে প্রকৃতির অনবদ্য রূপ উপভোগ করা যায়।

সে বছর জাঁকিয়ে শীতও পড়েছিল। বিকেল থেকেই কুয়াশার চাদরে ঢেকে যেতে থাকে চারপাশ। যেন এক মায়াজাল ছড়িয়ে যায় ক্রমশ। একজন স্থানীয় যুবক আমাদের খবর দিল যে পরের দিন পি.ডব্লিউ.ডি. বাংলোতে শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এবং শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় আসবেন। খবরটি শুনে আমার মনে হল যে এঁদের সঙ্গে দেখা করার একটি সুযোগ হতে পারে। সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে এলাম। রাত্রে কিছু কবিতা কপি করে পরের দিন স্কুলে পৌঁছোই। বিকেলের দিকে আমরা বাংলোর চত্বরে প্রবেশ করি। সে সময়ে বাংলোটি দেখতে খুবই সুন্দর ছিল। ঢোকার পর বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গা। পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। বিভিন্ন রংয়ের ফুলগাছ, পাতাবাহার, ছোট ছোট হলুদ পাতাযুক্ত বাহারি গাছে সজ্জিত। নদীর পাড়ে বিশাল আমগাছের গোড়া পাকা করা, রং লাগানো। সেখানে বসে সামনের দৃশ্য দু'চোখ ভরে তুলে নেওয়া যায়। বাংলো থেকে বাঁধানো সিঁড়ি নদীতে নেমে গিয়েছে। জঙ্গল, নদী পেরিয়ে - সিঁড়ি বেয়ে বন্য জন্তু বাংলোয় উঠে আসতে পারে।

আমরা যে বাংলোতে আসতে পারি সেটা অতিথিদের ভাবনার বাইরে ছিল। কাচে ঘেরা উপরের ঘরে উঠেই দেখি সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তার ছবি দেখেছিলাম বলে চিনতে ভুল হয়নি। তিনি বাইরের দিকে তাকিয়ে কিছু খাচ্ছিলেন। টি টেবিলে লেখার কাগজ ছড়ানো ছিটানো। হাতে কলম। কিছু লিখছিলেন। ধীর, স্থির, অবিচল। সৌজন্য বিনিময়ের পর বসতে বললেন। জেনে নিলেন আমাদের নাম। কী করি, কোথায় থাকি এ সব। গভীর জঙ্গলের ভিতর দ্বীপের মতো জয়ন্তীতে একটি হাই স্কুল রয়েছে জেনে বিস্মিত হয়েছিলেন। স্কুল, পরিবেশ, স্থানীয় মানুষ এবং তাদের জীবনজীবিকা নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ কথা হল। জানালেন শক্তি আসেননি, তবে শীর্ষেন্দু এসেছেন। পাশের ঘরেই রয়েছেন। আমরা দেখা করব কিনা। আমরা সুনীলদার সঙ্গেই সময় কাটালাম। আর কাউকে বিরক্তি করতে চাইলাম না। সাহিত্য সম্পর্কিত টুকিটাকি কথাও হল। এরপর আমি আমার অভিপ্রায় জানাতেই তিনি স্মিত হেসে মাথা নাড়লেন। সম্মতি পেয়ে কয়েকটি কবিতা সুনীলদার সামনে পেশ করলাম। তিনি পাণ্ডুলিপিগুলো হাতে নিয়ে একটু দেখে বললেন, 'কবিতাগুলো রেখে যাও, আমি রাত্রে দেখব। পরের দিন বাংলোয় এসে নিয়ে যেও।' আমি বললাম, 'ঠিক আছে।'

আমরা নীচে নেমে যাবার সময় তিনিও আমাদের সঙ্গে এলেন এবং বললেন, 'চলো নদীতে যাই'। নদীর ঠান্ডা জল ছুঁয়ে উঠে দাঁড়াতেই মনে হল খয়ের বনের পাশ থেকে বিকেলের নদীজলে কে যেন স্নান করতে নেমেছে। সে কি অরণ্যকন্যা! জলপরি, না নীরা! তাঁর একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকায় ছেদ টেনে বলি, 'এখানে কি নীরাকে খুঁজছেন?' তিনি জুলফিতে ডানহাতের বুড়ো আঙুলের স্পর্শ রেখে বললেন, 'আমি নীরাকে কোথাও খুঁজে পাইনি, জানো। সেই কতদিন ধরে খুঁজেই চলেছি। নীরাকে কোথাও পাওয়া যায় না, পাওয়ার আশায় পথ হাঁটতে হয় অনেক বছর। সে পথ শেষ হলেও হয়তো তুমি তোমার কাঙ্ক্ষিত মানুষীকে পেলে না। জীবন এর জন্য অবশ্য থেমে থাকে না। সে একবিন্দু থেকে আর এক বিন্দুতে পৌঁছে যায়। এক বোধ থেকে আর এক বোধের গভীরে ঢোকে।'

সেই মুহূর্তে খয়ের বনের পাশ দিয়ে একঝাঁক বনটিয়া উড়ে গেল। অদূরেই সাঁ-চি-ফুঁ রেঞ্জ। পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে সাদা মেঘ। দূরে ডলোমাইটের পাহাড় থেকে ডলোমাইট নিয়ে ট্রাকগুলো নীচে নেমে আসছে। পাহাড়ের গায়ে ট্রাকগুলোকে ছোট ছোট খেলনার মতো মনে হয়। মনে হয় এখনই নীচে গড়িয়ে পড়বে। পাহাড়ের এক জায়গায় ফাটল বাঘের রূপ নিয়েছে। সেটি বাঘখাত নামে পরিচিত। বাঘখাতের মুখের উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে সাদা বক। রসদ বোঝাই ঝুড়ি পিঠে নিয়ে পাথুরে পথ ধরে ফিরে যাচ্ছে পাহাড়িয়া মালবাহক। নদীর বুক থেকে বজরি-পাথর তুলছে স্থানীয় শ্রমিকরা। আমরা নদী পেরিয়ে ভুটিয়াবস্তির দিকে এগোতে থাকলাম। একবার পিছনে তাকিয়ে দেখি সুনীলদা জলের

**পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে সাদা মেঘ। দূরে ডলোমাইটের পাহাড় থেকে ডলোমাইট নিয়ে ট্রাকগুলো নীচে নেমে আসছে। পাহাড়ের গায়ে ট্রাকগুলোকে ছোট ছোট খেলনার মতো মনে হয়**

কাছে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছেন, ধুঁয়োগুলো পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে।

একদিন পর বাংলোয় গিয়ে শুনি সুনীলদারা সকালেই চলে গিয়েছেন এবং আমার কবিতাগুলো কারও কাছে রেখেও যাননি। সেইসময় বাংলোর তদারক শিবুদার কাছে রাখা ভিজিটিং বুক খুলে দেখি সেখানে কারও সই নেই। তাতে লেখা আছে ডিপার্টমেন্ট অব ট্যুরিজম। মহা সমস্যার কথা। কী করা যায়? বেশ কয়েকদিন পর 'দেশ' পত্রিকায় সরাসরি একটি চিঠি লিখলাম। সুনীলদা কিছুদিনের মধ্যেই আমাকে লেখা তার প্রথম প্রত্যুত্তর পাঠালেন 'দেশ' নামাঙ্কিত পোস্টকার্ডে, লিখলেন - 'প্রীতিভাজনেষু, তোমাদের কথা মনে আছে। তোমার কবিতার কপিগুলি ডাক বাংলোর চৌকিদারকে দিয়ে আসতে ভুলে গিয়েছি। সেজন্য লজ্জিত। আশা করি, ওই কবিতার আরও কপি আছে। ... পরে নতুন কবিতা পাঠিও'।

# কবিতা

## আমার আকাশে ফুটে ওঠে ভোর তুমি হও শুকতারা

### রবীন্দ্রনাথ
### শ্যামাচরণ কর্মকার

অগোছালো দিন, ঝড়ে কাঁপা-রাত
ঘুম কাড়ে যদি আজও
চোখের পাতারা স্বপ্ন হারায়
জীবন ছন্নছাড়া
বিচলিত মনে আলো হয়ে তুমি
রিনিঝিনি সুরে বাজো
আমার আকাশে ফুটে ওঠে ভোর
তুমি হও শুকতারা।

অশান্ত মন হতাশাকে ছিঁড়ে
জীবনের গান গায়
শান্ত-সৌম্য মুখচ্ছবিটি
আমার দু'চোখে ভাসে
আশার তটিনী পাল তুলে ছোটে
ছন্দটা খুঁজে পায়
আমার জীবনে এভাবেই দেখি
রবীন্দ্রনাথ আসে।

### হৃদয়খাতায় আঁকিবুকি
### চিরঞ্জীব রায়

জানলার একটা পাল্লা খুলে দিলেই
ঘরটা অনেক বড় হয়ে যায়।
মেঝে ভরে যায় নলখাগড়ায়
তখন আচমকা দেওয়ালের রঙে
আকাশের নীল
শিউলিগন্ধী বাতাসে
স্মৃতিরা দোল খেতে চায়।
হৃদয়খাতায় আঁকিবুকি বেশ অনায়াস হয়।
নাছোড়বান্দা মুখোশটা খুলে
হিসেবনিকেশ শিকেয় তুলে
জমে থাকা সব দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে
তখন বেবাক ভালোবাসা যায়।

### বিয়োগ চিহ্ন
### দেবাশিস সেনগুপ্ত

একা, আকাশের মাথায় চড়ে বসেছেন
অবিমৃশ্যকারী এক কবিরা আত্মা
ফুঁ দিলেন শঙ্খে, শব্দেরা গেয়ে উঠল বসন্ত সংগীত
বুড়ুর কণ্ঠস্বরের গন্ধে, বুড়ুর কলহের গন্ধে
বহুকাল বাদে, বিব্রত বোধ করলেন কবি

পুনরায় ফুঁ দিলেন শঙ্খে, অক্ষরের আর্তনাদে
ক্রমশ ঝাপসা হয়ে আসছে চারপাশ
মেঘের উপর বসে নির্বিকার হাই তুললেন
নির্বস্ত্র অহংকারী কবির আত্মা
এরপর?
কাঁধের ঝোলাটি সযত্নে টাঙিয়ে রাখা
হল আমাদের এই ভারতবর্ষে
প্রসারিত হল বিদেহীর শীর্ণকায় আঙুল
শূন্যের শরীরে চুপিচুপি এঁকে দিলেন
এক বিষণ্ণ বিয়োগচিহ্ন

### ম্যাগমা
### সোমেন রায়

চলো পৃথিবীর হাত ধরি
লাভারা এখনও জ্বলছে,
ভিতরের ওইটুকু আগুন
আমার ল্যাম্পপোস্টের একটু আলো
চলো মানুষের হাত ধরি
তারাও লাভা আমি ল্যাম্পপোস্ট, আমরা ম্যাগমা।

*অঙ্কন ঃ শংকর বসাক*